দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ বক্তৃতা ও বিবৃতি

ফজলুল হক

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড– এই বিশ্ব-স্বীকৃত সত্যবাক্যটিকে আমরাও . সদা সদম্ভে ঘোষণা করে থাকি, কিন্তু কার্যত মানি না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে যেকোন পর্যায়ের মন্ত্রী, নেতা, ব্যক্তিত্ব যারাই যখন শিক্ষা বিষয়ে কোন কথা বলার সুযোগ পাই, তখনই বেশ ওজনদার লাগসই বুলি কপচাই। যেমন যেকোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিক্ষা, শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা কথার রাজা। কথা বলতে তো আর খরচ লাগে না। কোন ট্যাক্সও দিতে হয় না। সুতরাং, কথা বলে যদি কারও মনটাকে কিছু ভিজানো যায় তাতে ক্ষতি কি! তাতে তাৎক্ষণিক কিছু তারিফ তো মিলেই।

বস্তুত দেশ এখন চলছে বক্তৃতা–বিবৃতির জোরেই! সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলো খুলে বসলেই শনৈঃ শনৈঃ উন্নয়নের যে খতিয়ান পাওয়া যায়, তার যোগফলে দেশ এতদিন উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার কথা। কিন্তু, বাস্তবে কি হচ্ছে তার প্রমাণ তো সবার চোখের সামনেই।

গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী যদি জবাবদিহিতার কোন বাধ্যবাধকতা থাকতো, তাহলে বেহিসেবী বক্তৃতা–বিবৃতি প্রদানের জন্য অনেককেই পদে পদে জব্দ হতে হতো। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে যে কেউ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী গত বছর ১৩ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে আপনি যে বললেন, 'শিক্ষাকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে', 'সকল উন্নয়ন প্রয়াসের ভিত্তি শিক্ষা'–এসব কথা কি সত্যি সত্যি আপনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন? জবাব যদি 'হ্যাঁ হয়, তবে বলুন তো বাস্তবিক অর্থে এজন্য আপনি কি করেছেন? হ্যাঁ, কাগজে–কলমে বাজেট–বরাদ্দে শিক্ষার স্থান উর্ধ্বে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া বলতে যা বোঝায় প্রকৃত অর্থে তা কি পূরণ করছে কাগজ–কলমের ঐ বাজেট বরাদ্দ? আর এই যে, 'ভিত্তি'র কথা বলেছেন, তা কি নিশ্চিত করতে পেরেছে ঐ বাজেট বরাদ্দ? সঠিক জবাব, নিশ্চয়ই না। শিক্ষাকে জাতীয়করণ (সরকারীকরণ নয়) না করা হলে 'ভিত্তি'র ব্যাপারটা কখনোই নিশ্চিত করা যাবে না। আর, 'ভিত্তি'র ব্যাপারটা নিশ্চিত না করে শিক্ষাকে যতই উর্ধ্বে স্থান দেয়ার কথা বলা হোক না কেন তা হবে নিতান্তই ফাঁকা বুলিমাত্র।

বাজেট বরাদ্দে শিক্ষার ঘরে একটা বড় অঙ্ক বসিয়ে রেখে, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস বজায় রেখে, কল্যাণ–ভাতার নামে বেসরকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের হাতে ক'টা বেশি টাকা ধরিয়ে দিয়ে, দলীয় স্বার্থের হিসেব–নিকেশ কষে অপরিকল্পিতভাবে দু'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণ করে বা উন্নয়ন স্কীমের নামে কয়েক লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে যদি মনে করা হয় শিক্ষাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দেয়া হলো তাহলে বিরাট ভুল হবে। কারণ, মনে রাখা দরকার, মেরুদন্ড দু'টো হয় না। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে স্বীকার করলে, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান শ্রেণী বিন্যাসের অবসান ঘটাতে হবে। নতুবা, জাতির মেরুদন্ড বিভক্ত হয়ে যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন–সুবিধা বাড়িয়েই করা যাবে এটা যদি কেউ মনে করেন, তাহলেও ভুল হবে। কারণ, এর দ্বারা শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত হবে না। যে দেশের ৮৫ ভাগ ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষার সমান সুযোগ ভোগ থেকে বঞ্চিত তাদের দিকেও সমভাবে নজর দিতে হবে। একথা সবাই জানেন, সরকারী শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র–ছাত্রীরা যে ধরনের সুযোগ–সুবিধা পেয়ে থাকে তার সামান্যতমও পায় না বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র–ছাত্রীরা। অথচ, লেখাপড়ার জন্য এরাই বেশি ব্যয় করে থাকে। সরকারের শিক্ষাখাতে কর হিসেবে বেশি পয়সা যোগান দিয়েও থাকে এদেরই অভিভাবকরা। সুতরাং, শিক্ষক–কর্মচারীদের অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে ৮৫ ভাগ ছাত্র–ছাত্রীর অবস্থার উন্নয়নের কথাও ভাবতে হবে। তবে হ্যাঁ, শিক্ষকের কথা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাবতে হবে এ কারণে যে, শিক্ষকের পদটি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন না হলে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন না। যেমন এখন হচ্ছেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে অবক্ষয় এটা তার অন্যতম মূল কারণ।

ভাল ছাত্র–ছাত্রীরা প্রায় কেউই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ এ পেশায় না আছে পয়সা, না আছে মর্যাদা। পয়সা অবশ্য কোন কালেই ছিল না। কিন্তু মর্যাদা ছিল আর ছিল আদর্শের ব্যাপার। তাই, অতীতে দেখা গেছে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি মর্যাদা আর আদর্শের আহ্বানে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। শিক্ষকতার যথার্থ আদর্শ নিয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ– মন্ডিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রার্থনীয় সব প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এখন? এখন আদর্শের কথা কেউ আর তেমনভাবে আমলে আনতে চান না। অভাবের অবিরাম তাড়না আদর্শের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। অভাবের তাড়নায় যারা তাড়িত নন, তারাও মর্যাদাহীন এই পেশাকে আদর্শ পেশা হিসেবে স্বীকার করেন না। এখন অর্থ আর ক্ষমতাই হচ্ছে প্রকৃত মর্যাদার প্রতীক। বলা বাহুল্য, এ দু'টোর কোনটাই শিক্ষকতা পেশায় নেই। তাই, এ পেশায় আসছেন তারাই, যারা অন্য কোথাও জুতসই জায়গা পাচ্ছেন না (দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে)।

এ অবস্থার আশু পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবলমাত্র বক্তৃতা–বিবৃতি দিয়ে এ অবস্থার পরিবর্তন আনা যাবে না। অতীতে বহু বক্তৃতা–বিবৃতি জাতি শুনেছে এবং পড়েছে, বহু বক্তৃতা–বিবৃতির কথা এখনও জাতির স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (প্রথম ভাগে) ঢাকায় শিক্ষা পরিবেশ সংক্রান্ত চারদিনের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস আবশ্যক'। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। কেননা, শিক্ষাই একটা মানুষের সকল শক্তির উৎস।– সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি, এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আজ আমাদের সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে।'

এরপর পদ্মা– মেঘনা–যমুনার বুক বেয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু অবস্থার হেরফের খুব একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমান সরকার হয়তো বলবেন, শহীদ জিয়া তো তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগই পাননি, সুতরাং ঐ উদাহরণ টেনে কি লাভ! না, লাভ নেই ঠিকই; কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে, ঐ বক্তৃতার পরও তিনি পুরো তিন বছর বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় ছিলেন। ঐ তিন বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য এমন কিছু করেননি, যা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণটানার উদ্দেশ্য অবশ্য এও নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো এই যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত, সেই সূবাদে জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সমস্ত দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়। এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই উদাহরণটি টানা হলো।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বয়সও আড়াই বছর পেরিয়ে গেছে। 'সকল উন্নয়ন প্রয়াসের ভিত্তি' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবসম্মত কোন বিধি–বিধান আজও তৈরি হয়নি; মাঝে মধ্যে শিক্ষার উন্নয়নকল্পে পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনার কথা শোনা যায়; কিন্তু 'সকল উন্নয়ন প্রয়াসের ভিত্তি শিক্ষা'– একথা মেনে নেয়ার পর শিক্ষার উন্নয়নকল্পে পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনার মাধ্যমে 'ভিত্তি' গড়তেই যদি দশ–বিশ বছর লেগে যায়, ততদিন কি অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম থেমে থাকবে? শিক্ষা যদি জাতির মেরুদন্ড হয়, শিক্ষাই যদি একটা মানুষের সকল শক্তির উৎস হয় এবং সকল উন্নয়ন প্রয়াসের ভিত্তি যদি শিক্ষা হয়, তবে পর্যায়ক্রমে নয়, একই সঙ্গে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং তা করতে হবে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয়করণ (Nationalisation) করে। বক্তৃতা–বিবৃতি দিয়ে কোন কাজ হবে না। পদ্মা–মেঘনা–যমুনার বুক বেয়ে যেমন অনেক পানি গড়িয়েছে, তেমনি বক্তৃতা–বিবৃতিও অনেক হয়েছে। আর নয়। কথা বাদ দিয়ে কাজ করুন, মনকে চোখ ঠেরে কখনো কোন লাভ হয়নি, হবেও না।